মাথা নত না করার অহংকার

কামরুল মান্নান আকাশ

সাতই অক্টোবর ছিল ঢাকা ইউনিভারসিটি এ্যলামনাই এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া (DUAAA) - র অনুষ্ঠান “পূনর্মিলনী ২০১২ ”। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মদ্যোগি প্রাক্তন ছাত্ররা মিলে ২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়াতে এই সংগঠনটি গড়ে তোলেন। প্রাক্তন ছাত্রদের এই মিলন মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিবারই প্রকাশিত হয় "নানা রংয়ের দিনগুলি " নামের একটি সংকলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং "নানা রংয়ের দিনগুলি " এই নাম দুটির সাথে কেমন যেন

এক ভালোলাগা ও দুঃখ বোধ জড়িয়ে আছে। ভালো লাগে ফেলে আসা সোনালি দিন গুলোর কথা ভেবে। আর মন খারাপ হয়ে যায় সেই দিন গুলি হারিয়ে গেছে বলে। কথা হচ্ছিল এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সাধারণ সম্পাদক আনিস ভাই (আনিস মজুমদার) এর সঙ্গে। তিনি আমাকে এই সংকলনটির জন্যে কিছু একটা লেখার আহ্বান জানালেন। সেই তখন থেকেই ভাবছিলাম কি লিখব -গল্প, কবিতা নাকি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার কোন একটি। পূর্ব পুরুষের কথা না বলে নিজের কথা বললে তা যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায় - তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা না বললে বাংলাদেশের কথাও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই কলম চলতে শুরু করেছে। সে লিখতে শুরু করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের কথা, লিখছে এর সাহসী ছাত্রদের কথা। আর সময়ের ডানায় বসে আমিও উড়ে চলেছি পিছন পানে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আমি দেখছি এর ছাত্র হওয়ার বহু আগে থেকেই। আমার বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমার জন্ম, বেড়ে উঠা এবং শিক্ষা জীবন এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে কেন্দ্র করেই। হয়ত এখানে বেড়ে উঠার কারণেই আমি শৈশব থেকেই জড়িয়ে পরি এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সাথে। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আরো অনেকের মতো আমারও রয়েছে অজস্র স্মৃতি। স্মৃতিচারণ করার মত তেমন কেউ আমি নই। তবু জাতির প্রাণ কেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমিও একজন ছিলাম ভাবতেই ভালোলাগায় মন ভরে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থল। জ্ঞান চর্চা আর বিতরণের বাইরেও এর রয়েছে অধিকার আদায়ের সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই শুরু হয় ভাষা আন্দোলন, উত্তোলিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা।

ঊণসত্তুরের গণ অভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের সেই উত্তাল সময় এবং স্বাধীনতা উত্তর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন আমাকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেয়। সেই সময় (স্বাধীনতার পূর্বে) আমার বাবা শিক্ষকতার সাথে সাথে "ইকবাল হল"(বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) এর আবাসিক শিক্ষকের দায়িত্বও পালন করতেন। সেই সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জহুরুল হক হলের ছাত্র এবং গণ আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকা চরিত্রগুলোকে আমি দেখেছি খুব কাছ থেকে। তাদের ছিল আমাদের বাসায় যাতায়াত। সেই বয়সেই বাবার ছাত্ররা এবং তাদের স্বাধীনতাকামিতা, বিদ্রোহী মনোভাব, আর উদ্দাম সাহস আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করত। তাই বাবার অগোচরে তাদের সাথে আমার গড়ে উঠে এক অসম বয়সী সখ্যতা। তাদের সাথে লুকিয়ে চলে যেতাম বিভিন্ন সভা সমাবেশে। আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত মিছিল। দেখতাম প্রতিবাদের বিক্ষোভ মিছিল, অধিকার আদায়ের জঙ্গি মিছিল আর ই পি আর এর গুলিতে নিহত সাথীকে নিয়ে শোক মিছিল। নিজের অজান্তেই কখন যেন মিশে যেতাম সেই সব মিছিলে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ এমনকি স্বাধীনতার স্লোগানগুলোও ছিল এই ছাত্রদেরই অবদান।

একুশের গান গেয়ে, হাতে ফুল নিয়ে সামিল হতাম প্রভাত ফেরীতে। চারিদিক ভরে থাকত সেই অমর গানের সুরে। পহেলা বৈশাখে সূর্য উঠার আগে যেয়ে হাজির হতাম রমনা বটমূলে। বৈশাখী গান গেয়ে বরণ করে নিতাম নতুন বছরকে। এইখানে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি কেমন করে গানের সুরে সুরে বদলে যায় জীবনের মানে। একুশের শোকের সুর পরিণত হয় স্বাধীনতার রণ সঙ্গীতে। যখনই আঘাত এসেছে ভাষার উপর, সংস্কৃতির উপর রুখে দাঁড়িয়েছে এর ছাত্ররা। স্বৈরাচার যখনই কেড়ে নিতে চেয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার, স্বাধীনতা হয়েছে বিপন্ন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। দেখেছি শহীদের লাশ কাঁধে নিয়ে সহযোদ্ধার রক্ত মারিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে কি করে এগিয়ে যায় এর ছাত্ররা। এই পথ ধরেই এসেছে স্বাধীনতা। এসেছে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন। ছাত্রদের এই আন্দোলন আর সংগ্রামে সবসময়ই পাশে থেকেছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। এই পরিবারের সদস্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, চায়ের দোকানদার ও ফেরিওয়ালারাও। পিতৃতুল্য শিক্ষকেরা বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন বিপন্ন ছাত্রদের। ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তারা এসে দাঁড়িয়েছেন ছাত্রদের কাতারে। ছাত্রদের সাথে নির্যাতিত হয়েছেন এই জ্ঞান তাপসেরা। কর্মচারীরা খোলেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রুদ্ধ – দ্বার। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝে চোখ দিয়ে যখন পানি পড়ছে অবিরল ধারায় – পানি নিয়ে এগিয়ে এসেছে চায়ের দোকানিরা। পরিশ্রান্ত ছাত্রদের কাছ থেকে পয়সা নিতে চায়নি ফেরিওয়ালারা। আহত ছাত্রকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নেয়নি খেটে খাওয়া রিকশাওয়ালা। কি এক আবেগ ও ভালোবাসায় এরা সঙ্গী হয়েছে ছাত্রদের আন্দোলনে!

স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরুতে এবং চূড়ান্ত বিজয়ের আগে রাজাকার – আলবদররা হত্যা করেছে দেশের সূর্য সন্তান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। মুক্তি যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্র – শিক্ষক – কর্মচারী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্যাগ এমনি মহান ।

স্বায়ত্তশাসিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আঘাত এসেছে বার বার। সরকারী অনুদানে পরিচালিত হয় বলে প্রতিটি সরকারই চেয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কায়েমি স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে। আর বিশ্ববিদ্যালয় সব সময়ই অবস্থান নেয় এর বিরুদ্ধে। হয় প্রতিরোধ – হয় সংঘাত। সরকার ভুলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া অর্থের উৎস দেশের জনগণ। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভুলেনা, বার বার রক্ত দিয়ে শুধতে চায় সে ঋণ। তাই আজো দেশের মানুষ তাকিয়ে থাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। তাকিয়ে থাকে এর সত্য উচ্চারণের দিকে। তারা যে কোন মূল্যে জানতে চায় সত্যকে।

প্রদীপের নিচেও থাকে অন্ধকার – ফুলেও থাকে কাঁটা । তাই আমরা দেখি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই ঘটে নৃশংস হত্যাকাণ্ড, ছাত্রী মিছিলে হয় হামলা আর চরম উচ্ছৃঙ্খলতা। অশুভ শক্তির সাথে হয় শুভ শক্তির লড়াই। এখানে দুর্বৃত্তরা বুক ফুলিয়ে হাঁটে। আবার এখানেই গড়ে উঠে প্রতিরোধ। বিজয় হয় শুভ শক্তির। কেটে যায় অন্ধকার।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রই এক একটি লড়াকু সৈনিক। এক এক জন সাহসী যোদ্ধা। তদের এই সাহসের জন্ম পেশীতে নয় মনের গহীনে। এ সাহস নৈতিকতার।এ সাহস হার না মানার। এ সাহস বার বার পরাভূত করে পেশী শক্তিকে। এ সাহস রুখে দেয় সামরিক বাহিনীকে, রুখে দেয় স্বৈরতন্ত্রকে।

সময় বয়ে চলে। পরিবর্তনশীল জীবনে সব কিছুই পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী চেতনার পরিবর্তন হয় না। তাই তো অহংকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আজো দাঁড়িয়ে আছে অপরাজেয় বাংলাকে বুকে ধারণ করে মাথা নত না করার প্রতীক হয়ে।